Vol. 40 | No. 2 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ সমালোচনা : বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ ব্যুৎপত্তিকোষ : সত্যনারায়ণ দাশ

Volume	40
Issue	2
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Rafiqul Islam
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i2.9
Pages	209-220
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ সমালোচনা

.....

Check for updates

বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ ব্যুৎপত্তিকোষ। সত্যনারায়ণ দাশ

পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁর *History of Bengali Language* গ্রন্থে বাংলা ভাষায় প্রায় ৭৮টি দ্রাবিড় শব্দের তালিকা এবং বিভিন্ন দ্রাবিড় ভাষায় সে শব্দগুলির রূপ এবং ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেছেন। শব্দগুলি হচ্ছে, কাল, কুটি অথবা কুটির, কুটুম্ব, কটু, কুড়ে বা কুড়িয়া, কুটনি, বালা, কুড়ি, মামা, মালা, মলয়, মীন, শঙ্খ, তাম্র, তরকারী, কালা, খোঁটা, গোটা, চিকন, চীনা (জোঁক), ঠাট্টা, নোলা, নিরাপা, পাল, বিল্লি, মাগন, মুড়া টি প্রভৃতি। সত্যনারায়ণ দাশ তাঁর *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার যে ৭৮টি দ্রাবিড় শব্দের একটি সূচি দিয়েছিলেন তাঁর বইয়ে সে শব্দগুলি আসলে সংস্কৃতে গৃহীত দ্রাবিড় শব্দের তালিকা। প্রধানত গুন্ডাট, কলওয়েল ও কিটেলের অনুসরণে তিনি এই সূচি প্রস্তুত করেছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন, বাংলায় যে সমস্ত দেশী শব্দ প্রচলিত, যাদের ইন্দো-য়ুরোপীয় জ্ঞাতিশব্দ নেই তাদের অনেকগুলি দ্রাবিড় ভাষার হতে পারে। ড. সত্যনারায়ণ দাশের মতে, বাংলায় সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচয়িতারা বাঙালির সঙ্গে দ্রাবিড়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সম্পর্ক নির্ণয়ের দিকটি অবহেলিত থাকার কারণ নির্দেশ করেছেন— বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিকদের আর্যভাষা প্রীতি। সত্যনারায়ণ দাশ তাঁর গ্রন্থে বাঙালি জাতি ও ভাষার ইতিহাসে দ্রাবিড় উপাদান সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও আর্য এই তিন জাতির রক্তের সংমিশ্রণে বাঙালির উৎপত্তি। এই তিনটি সংস্কৃতির মিলনে জন্ম নিয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি। এই তিন জাতির কোনটিই ভারতের আদি বাসিন্দা নয়, আদি অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর জন এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় কোন অঞ্চল থেকে এসে সারা ভারতবর্ষ দখল করে তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় জাতি, তারা বাংলায় এসে পৌঁছলে এখানকার অস্ট্রিক

অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণে এক নতুন জাতির উদ্ভব হয়, এরপরে আসে আর্যরা তবে ভারতে আগমনের আগে গোলমুণ্ডবিশিষ্ট আরো তিনটি নরগোষ্ঠীর, আলপার্নীয়, আর্মানীয় ও দিনারীয়দের সঙ্গে আর্যদের মিশ্রণ ঘটেছিল, তারা আর্য ভাষা গ্রহণ করে আর্যগোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েছিল। ভারতে আগমনের পরেও আর্যরক্তে মিশ্রণ ঘটে। উত্তর ভারতে প্রবেশকালে দ্রাবিড়দের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হয়ে দ্রাবিড়রা আর্যদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়নি। দ্রাবিড়দের বড় অংশ বিন্ধ্য পর্বতমালা পার হয়ে দক্ষিণ ভারতে চলে যায়, উত্তর ভারতে যে দ্রাবিড়রা থেকে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে আর্য রক্তের মিশ্রণ ঘটে।

উত্তর ভারতে রেখে যাওয়া দ্রাবিড়রা বহুদিন দ্বিভাষী থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি আর্যভাষাভাষী হয়ে পড়ে। এই ভাষান্তরিত দ্রাবিড়দের ভাষা বৈশিষ্ট্যের কারণে আর্য ভাষায় পরিবর্তন আসে। কোনো জাতি দ্বিভাষিক হলে বা পাশাপাশি একাধিক ভাষা চললে পারস্পরিক প্রভাব স্বাভাবিক। মধ্যভারতীয় আর্য ভাষায় এ কারণেই অনার্য উপাদানের প্রাচুর্য।

বাংলায় অবশ্য গুপ্ত যুগের আগে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেনি তবে কিছু 'ব্রাত্য' বা পতিত আর্য সম্ভবত আর্য সংস্কৃতি নিয়ে বাংলায় আগমন করেছিল। বাংলায় আগমনের পর আর্য বা উত্তর ভারতের আর্য দ্রাবিড় মিলন সম্ভূত শংকর জাতি আর বাংলার পুরোনো বাসিন্দা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মিলন সম্ভূত শংকর জাতির মধ্যে পুনরায় সংঘাত ও সমন্বয় ঘটে। দীর্ঘদিন বাংলার এই আর্য-অস্ট্রিক-দ্রাবিড় শংকর জাতি দ্বিভাষী (না ত্রিভাষী?) ছিল, ধীরে ধীরে তারা আর্য ভাষা গ্রহণ করে। সে জন্যেই পূর্বী মাগধীতে প্রবেশ করে প্রচুর দ্রাবিড় উপাদান। বাংলায় আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক উপাদানের প্রভাবে। বাংলায় দ্রাবিড় প্রভাব এসেছে দু'দিক থেকে, বাংলায় দ্রাবিড় ভাষী বাসিন্দা আর উত্তর ভারতে আর্য-দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণ থেকে। বহু দ্রাবিড় উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে আর্য সংস্কৃতিতে যেগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালী লাভ করে, ভাষার ক্ষেত্রেও যা প্রযোজ্য। সত্য নারায়ণ দাশের মতে, বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব দুদিক থেকে এসেছে বলেই নব্যভারতীয় আর্য ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ের যে সাধারণ মিল সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ করেছেন তার অতিরিক্ত বহু লক্ষণ বাংলায় আছে। দ্রাবিড় বর্গের যে ভাষাটি বাংলায় চলিত ছিল এই বাড়তি বৈশিষ্ট্যগুলি সেই ভাষা থেকে পাওয়া।

সত্যনারায়ণ দাশ আর্য-ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষার সাধারণ মিল সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনার কথা উল্লেখ করেছেন, বিষয়টি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা* গ্রন্থের 'বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন' প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আধুনিক আর্য ভাষাগুলির সম্ভাব্য অনার্য শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তামিল, তেলেগু, কানাড়ীর প্রভৃতি দ্রাবিড় উপাদানের দিকে কলডায়ল, কিটেল, গুন্ডেট প্রমুখ পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ফলে আর্য ভাষাগত অনেকগুলি শব্দের মূল যে দ্রাবিড় ভাষায় সে বিষয়ে সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া আর্য ভাষার ওপর কোল জাতীয় ভাষার প্রভাব নিয়ে দুইজন ফরাসী পণ্ডিত জা পলিশুস্কি আর সিলভাঁ লেভি আলোচনা করেছেন। পশিলুস্কি দেখিয়েছেন, কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, কুড়ি, তাম্বুল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় (লগী) প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক আর্যভাষাগত শব্দ মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অনুরূপ অনার্য ভাষা বলত এমন অনার্য জাতির নিকট থেকে এসেছে, যে জাতির বংশধরেরা এখন আর অনার্য ভাষা বলে না। আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে নিজ সংস্কৃতি ভাষা নিয়ে উপমহাদেশে এসেছিল, নবাগত বিজেতা আর্য ও বিজিত অনার্য দ্রাবিড় ও কোল, এই ত্রিবিধ জাতির ধর্ম, সমাজনীতি, আচার অনুষ্ঠান, প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভ্যতা সব বিষয়েই তাদের জগতের মধ্যে মিশ্রণ ঘটল। আর্যদের ভাষাও উত্তর ভারতের অনার্যদের মধ্যে গৃহীত হয় কিন্তু অনার্য-ভাষীদের মধ্যে প্রসৃত হওয়ার ফলে তার আভ্যন্তরীণ রূপ, যা বাক্যরীতিকে অবলম্বন করে এবং নানা খুঁটিনাটি বস্তুতে যা প্রকাশ পায় তা বদলে যায়। আর্য ভাষার ধাতু ও শব্দ বিস্তর রয়ে গেল কিন্তু ভাষার কাঠামো অন্য ধরনের হয়ে গেল; অনার্য ভাষার মরা গাঙের খাত দিয়ে আর্য ভাষার ধাতু-ও শব্দ-রূপ জল বেয়ে চলল। এ অবস্থায় আর্য ভাষা গ্রহণকারী অনার্যদের মধ্যে অনার্য ভাষার কিছু শব্দ থেকে যাওয়া আশ্চর্যের নয়। কিটেল কর্তৃক সংকলিত কানাড়ী-ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃতিগত, অবিসংবাদিত-ভাবে প্রমাণিত অথবা সম্ভাব্য, সার্ধি-ত্রিশত দ্রাবিড় শব্দের আলোচনা রয়েছে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচ্য প্রবন্ধে আর্য ভাষায় অনার্য উপাদানের কতিপয় উদাহরণ দিয়েছেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাম্বুলের কথা উল্লেখ করে পান খাওয়া, পান দিয়ে সংবর্ধনা জানানো, পূজায় পান দেওয়ার প্রথা নির্দেশ করেছেন। পান আদি যুগের আর্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল এবং অনার্য ভাষা থেকে গৃহীত, 'তাম্বুল' শব্দের আর্য ভাষায় প্রবেশ ও অনুরূপভাবে কোল ভাষা থেকে। 'বারুই-

বরোজ' এই দুইটি দেশী শব্দ বাংলা ভাষায় অনার্য ভাষা থেকে অধিগত। বাংলা ভাষায় শত শত প্রাকৃত এবং দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন অনার্য (মোন-খেমের, কোল, দ্রাবিড়) শব্দ গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিদ্যমান কিন্তু অনাদৃত এবং কৃষক ও নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাবের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সে প্রভাব কোল না দ্রাবিড় তা বিবেচনা করেছেন *বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে তিনি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ইংরেজি ভাষায় লিখিত 'বাংলা ভাষার ইতিহাস' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বাংলা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থে যার সমর্থন রয়েছে তার পর্যালোচনা করেছেন। আর্য ভাষার মূর্ধন্য ধ্বনিগুলি দ্রাবিড় প্রভাবজাত ধারণা সম্পর্কে শহীদুল্লার মত মূর্ধন্য উচ্চারণ কোল ভাষাতেও দৃষ্ট অধিকন্তু বাংলা ভাষার মহাপ্রাণ উচ্চারণ কোল ভাষাতে দেখা যায় কিন্তু দ্রাবিড় ভাষায় নেই। দ্রাবিড় প্রভাবশত শব্দের আদিতে বাংলা ভাষায় কোনো যুক্তাক্ষর থাকতে পারে না ধারণা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত, হিন্দু-মারাঠী-গুজরাতী-পারসী প্রভৃতি বহু আধুনিক এবং কোল ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কর্ম ও সম্প্রদানের 'কে' বিভক্তি তামিলের 'কু' বিভক্তি থেকে এসেছে অনুমানকে তিনি আকস্মিক সাদৃশ্য বলেছেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার বহুবচনের বিভক্তি 'গুলো' এবং 'রা' দ্রাবিড় 'গল্' এবং 'অর্' থেকে এসেছে ধারণা করেছেন, শহীদুল্লাহ্ 'গুলা' বিভক্তির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত 'কুল' থেকে আর বহুবচন 'রা' বিভক্তির ব্যুৎপত্তি অন্য ইতিহাস নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বাংলা ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়ভাষার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে মালতো ও তেলেগু ভাষার সঙ্গে করতে হবে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় কোল ভাষার প্রভাব গভীর মনে করেন, সর্বোপরি তিনি তিব্বতী-বর্মী প্রভাব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাসমূহে লক্ষ্য করেছেন। পূর্ববঙ্গে যে 'ঘ', 'ধ', 'ভ', 'ড়' (ঢ়) যথাক্রমে 'গ', 'দ', 'ব', 'র'-রূপে উচ্চারিত হয় তা এই প্রভাবের ফল রূপে নির্দেশ করেন। চ-বর্গের দন্ত্যতালব্য ঘৃষ্ট উচ্চারণের কারণও একই প্রভাবজাত। তার মতে, গম (ভাল), বেয়া (মন্দ), তাম্বু (সূর্য) প্রভৃতি শব্দ তিব্বতী-বর্মী ভাষা থেকে গৃহীত। তাঁর মতে, বাংলা ভাষার গঠনে একমাত্র মুণ্ডা বা কোল ভাষা ভিন্ন অন্য অনার্য প্রভাব নেই বললেই চলে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে মুণ্ডা প্রভাব নির্দেশ করেছেন নিম্নরূপ, বাংলা ভাষায় দ্বিস্বরধ্বনির সংখ্যাধিক্য মুণ্ডা ভাষারও বৈশিষ্ট্য; বাংলা ভাষায় যে কোন স্বর অনুনাসিক হতে পারে, মুণ্ডা ভাষাতেও অনুরূপ। বাংলা ভাষায় স্বরসঙ্গতি সম্পর্কে তিনি সুনীতিকুমারের সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে ঐ বিষয়ে বাংলা ভাষার সাদৃশ্য নির্ণয় এবং দূরবর্তী কুরকু ও কোল ভাষায় ঐ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জর্জ গ্রীয়ার্সন এ ক্ষেত্রে দ্রাবিড় ভাষার ওপর মুণ্ডা ভাষার প্রভাবের মত সমর্থন করেন। খাঁটি বাংলা শব্দ অন্তঃস্থ 'য়' এবং 'ব' দিয়ে আরম্ভ হয় না, মুণ্ডা ভাষাতেও একই নিয়ম। বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের উষ্মধ্বনি তিনটিই 'শ' কার উচ্চারিত হয়, মুণ্ডারী, সাঁওতালী ও কুরকু উচ্চারণ রীতি থেকেও বোঝা যায় মুণ্ডা ভাষাতেও তদ্রুপ 'শ'-কার উচ্চারণ। 'ল' ও 'ন' ধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন বাংলায় দেখা যায়। এ পরিবর্তন মুণ্ডাতেও বর্তমান। 'ণ', 'ড়', 'ঢ়' দ্বারা কোন বাংলা শব্দ শুরু হয় না, মুণ্ডা ভাষাতেও একই রীতি। স্বরধ্বনির পরিমাণের দিক দিয়েও উভয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষণীয়, এ বিষয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ উদ্ধৃতি দিয়েছেন সুনীতিকুমার থেকে, "এ স্থলে বাংলার সহিত সাঁওতালী ভাষার কতিপয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়: যেমন, বাংলায় একাক্ষরিক (monosyllabic) মূল শব্দগুলি (base words) সর্বদাই দীর্ঘ, সাঁওতালীতেও তদ্রূপ। দুই মাত্রিক শব্দের প্রতি বাংলার প্রবণতা সাঁওতালীতেও দেখা যায়: অর্থাৎ একটি দীর্ঘাক্ষরিক বা দুইটি লঘু আক্ষরিক অথবা একটি খুব লঘু-আক্ষরিক ($\frac{১}{২}$ মাত্রা বা $\frac{৩}{৪}$ মাত্রার) ও অন্যটি দীর্ঘ ($১\frac{১}{২}$ বা $১\frac{১}{৪}$ মাত্রার) অক্ষরের দ্বারা গঠিত দুই মাত্রার শব্দের দিকে ইহাদের ঝোঁক আছে। আবার বাংলার মতোই, একাক্ষরিক মূল শব্দগুলিতে বিভক্তি যোগ করা হইলে ইহারা দীর্ঘতা হারাইয়া দুইটি লঘু আক্ষরিক শব্দে পরিণত হয়।"

বাংলা ও মুণ্ডার রূপতাত্ত্বিক সাদৃশ্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, খাঁটি (তদ্ভব ও দেশী) বাংলা শব্দে বিশেষণের অন্বয় বিশেষ্যের বচন, লিঙ্গ ও কারকের সঙ্গে হয় না, মুণ্ডাতেও অনুরূপ। বাংলা ও মুণ্ডা উভয়-ভাষাতেই লিঙ্গবাচক শব্দের পূর্বে পুরুষ বা স্ত্রীবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করে লিঙ্গ নির্দেশ করা হয়। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষায় উভয় লিঙ্গবাচক শব্দের উত্তরে পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, বাংলার ব্যবহার তা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। বাংলা ও মুণ্ডায় মূল শব্দের সঙ্গেই কারকবিভক্তি যুক্ত হয়, অকর্তৃকারকের রূপে নয়, দ্রাবিড় ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র, সেখানে কারক-অব্যয়সমূহ অকর্তৃকারকের রূপে যুক্ত হয়। ড. শহীদুল্লাহ্ বাংলা ও মুণ্ডার কতিপয় বিভক্তির সাদৃশ্য প্রদর্শন করে মন্তব্য করেছেন এই সকল কারক-বিভক্তি কেবল একবচনে নয়, বহুবচনেও যুক্ত হয়। তিনি বলেন, বাংলা কারক অব্যয় সব প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে কিন্তু কারক বোঝাতে তা যেভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চয়ই অনার্য প্রভাবজাত। বাংলায় ধাতুরূপ কতিপয় ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃকারকের সর্বনাম যৌগিক আকার ধারণ

করে, এ ভাবে মুন্ডা ভাষাতেও কর্তা কোন পুরুষ তা সর্বনামঘটিত অনুসর্গ দ্বারা নির্দেশিত হয়। বাংলায় বিশেষ্য ও সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে নির্দেশক -টা, -টি ব্যবহৃত হয়, মুণ্ডাতেও অনুরূপ নির্দেশকের ব্যবহার রয়েছে। পদক্রমের ক্ষেত্রে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ও মুণ্ডার নিম্নরূপ সাদৃশ্য নির্দেশ করেন, বাংলা বাক্যে পদক্রম (১) সম্বোধন, (২) সম্বন্ধ, (৩) কর্তৃকারক, (৪) কর্মকারক, (৫) ক্রিয়াপদ, মুণ্ডা ভাষাতেও একই ক্রম। মুণ্ডা ভাষার মত বাংলাতেও পরোক্ষ উক্তি ব্যবহৃত হয় না। বাংলা ভাষায় শব্দদ্বৈতের প্রয়োগবাহুল্য দেখা যায়, সাঁওতালী ও অন্যান্য মুণ্ডা ভাষাতেও শব্দদ্বৈতের প্রচুর ব্যবহার। বাংলায় ক্রিয়ারূপগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহার করা যায়, সাঁওতালী ও মুণ্ডারী ভাষায় ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শব্দকোষের আলোচনায় সে সব শব্দই গ্রহণ করেছেন যা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না ফলে তিনি কদলী, ময়ুর, কম্বল, তাম্বুল প্রভৃতি শব্দ বাদ দিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কাঁড়া (মহিষ) ও মেনী (বিড়াল) শব্দ দুটি মুণ্ডা ভাষা থেকে বাংলায় আগত বলেছেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, সাঁওতালী ভাষা থেকে আগত আকাল, আখড়া, বড়শী, বট, বয়ার, বেঁটে, বেঁড়ে, চাউল, চুলা, ডেলা, ঢাল, ডোঙ্গা, হা, হুড়কা, কালা, খচ্চর, খুঁটি, মোট, মোটা, নেঙ্গা, রাঁড়, লড়াই, ঠোঙ্গা, তোতলা। অধ্যাপক পচুলুস্‌কি যে দেখিয়েছেন বাংলা 'কুড়ি' শব্দটি মুণ্ডা ভাষা থেকে এসেছে তিনি তার উল্লেখ করেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের মতে, বর্তমানে যে ভূভাগে বাংলা ভাষা প্রচলিত তা এককালে অস্ট্রিক ভাষাভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলের অংশ ছিল, বাংলায় অস্ট্রিকভাষীরা বাংলা ভাষায় কেবল তাদের বাক্‌ভঙ্গীর ছাপই রেখে যায়নি শব্দকোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বহুশব্দ যোগ করেছে। অপরদিকে ড. সত্যনারায়ণ দাশ তাঁর *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ* গ্রন্থে দ্রাবিড় ব্যুৎপত্তিসহ দু'হাজারেরও বেশি দ্রাবিড় শব্দ সংকলন করেছেন, যার মধ্যে 'শ' দুয়েক এসেছে সংস্কৃতের মাধ্যমে তৎসম বা তদ্ভবরূপে, যেগুলো সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ।

ড. সত্যনারায়ণ দাশ যে সব শব্দকে দ্রাবিড় উৎসজাত মনে করেন তার নির্বাচিত উদাহরণ, অগুরু, অঙ্ক, অঙ্কুর, অঙ্গন, অটবি, অট্ট, অট্টালিকা, অধর, অনল, অরণি, অরবিন্দ, অলক, অলস। আকড়া, আকাল, আকুপাকু, আগড়ম-বাগড়ম, আগল, আগলা, আচকা, আঁট, আটক, আটকা, আঁটকুড়ো, আটা, আঁটা, আঠা, আজ্ঞা, আড় (মাছ), আড়ত, আড়মোড়া, আড়াআড়ি, আড়াল, আড়ি, আড়শোলা, আলগা, ইচড়, ইট, উই, উঁকি, উকুন, উটকো, উঠান, উড়কি,

উদোস, উপুড়, উবু, উলু, উল্কা, উল্কি, উল্টা, এঁটেল, এঁটো, এঁড়ে, এঁদো, এয়ো, এলানো, এলোমেলো, ওগরা, ওঝা, ওৎ, ওলাওঠা, কই, কউড়ি (কড়ি), ককানি, কচকচি, কচলা, কচি, কচুকাটা, কঞ্চি, কঞ্জুস, কট্টর, কঠিন, কঠোর, কড়কড়, কড়া, কণ্ঠ, কদম, কনুই, কপট, কপাট, কপোল, কবরী, কবল, কবাট, কমল, কয়লা, করবী, করোটি, কর্দম, কর্কশ, কলঙ্ক, কলহ, কলা, কলি, কল্লোল, কষ্টি, কাঁকর, কাঁকাল, কাচা, কাচ্চা, কাছা, কাছিম, কাজল, কাটা, কাটারি, কাঠবিড়াল, কাঠি, কাতুকুতু, কাদা, কানন, কানা, কানি, কাবারি, কামরাঙা, কামলা, কামার, কালা (ঠাণ্ডা), কালা (বধির), কালি, কাশ, কিচকিচ, কিচিড়মিচিড়, কিড়মিড়, কিল, কুকুর, কুঁচকি, কুচি, কুচিকুচি, কুঁজো, কুটকুট, কুটা (গুঁড়া করা), কুটির, কুটিল, কুটুম্ব, কুটো, কুঠরি, কুঠার, কুঁড়া, কুড়া, কুড়ি, কুঁড়ে, কুণ্ড, কুণ্ডল, কুণ্ডলী, কুন্তল, কুমড়া, কুমীর, কুরচি, কুরিকুষ্টি, কুলকুচি, কুলি, কুলুঙ্গি, কুলা, কূপ, কেঁড়া, কেয়া, কোকিল, কোচ, কোটর, কোটি, কোঠা, কোঁতাকুঁতি, কোপা, কোরক, কোলা, কৌটা, ক্যাঁক, ক্যাঁচ। খচখচানি, খঞ্জনী, খটমটে, খটরখটর, খণ্ড, খন্দ, খপ্পর, খরা, খল, খসা, খাঁখারি, খাঁ খাঁ, খাঁচা, খাট, খাটুনি, খাটা, খাঁটি, খাড়া, খাদ, খানা, খাবলা, খাবি, খামার, খাল, খালুই, খিচড়ি, খিল, খিলখিল, খুকি, খুচরা, খুরপি, খুলি, খেঁকি, খেদানো, খেসাড়ি, খোকা, খুঁটা, খুঁত, খুঁতখুঁতে, খুন্তি, খুপরি, খুর, খোঁচা, খোঁট, খোঁটা, খোঁড়া, খোদাই, খোপ, খোঁপ, খোঁয়ার, খোলস, খোলা, খোলামকুচি, খোঁস।

গঙ্গা, গজগজ, গজরগজর, গজানো, গঞ্জনা, গড়, গড়গড়া, গণ্ড, গণ্ডগোল, গণ্ডা, গণ্ডার, গদা, গদি, গনগনে, গপগপ, গবু, গর্দভ, গল্প, গলি, গাছ, গাঁজন, গাজা, গাঁজা, গাঁট, গাঁটরি, গাঁট্টা, গাট্টাগোট্টা, গাড্ডা, গাঁড়, গাড়ল, গাড়া, গাড়ি, গাদ, গদো, গাদাগাদি, গাবা, গাবুস, গাল, গিজগিজ, গিঁট, গিঁড়া, গুগলি, গুচ্ছ, গুছানো, গুজগুজ, গুজুরগুজুর, গুটানো, গুটি, গুঁটলি, গুড্ডু, গুড়া, গুড়ি, গুঁড়ি, গুন, গুণ্ডা, গুঁতা, গুঁতাগুঁতি, গুনগুন, গুমোট, গুলাগুলি, গুলতি, গুল্ম, গেঁজ, গেঁড়া, গোঙানি, গোঁজা, গোটা, গোড়া, গোবর, গোলমাল, গ্যাঁট, গ্যাঁড়া, গ্রাম। ঘট, ঘটি, ঘড়া, ঘণ্টা, ঘাট, ঘাঁটা, ঘাড়, ঘানি, ঘাপটি, ঘাবড়ানো, ঘাস, ঘুগনি, ঘুটঘুটে, ঘুণ, ঘুপচি, ঘেঁটি, ঘেরা, ঘোড়া, ঘোলা। চকচক, চঙ্গ, চঞ্চু, চট, চটক, চটকা, চটকানো, চটপট, চটা, চটি, চটাচট, চড়, চড়ক, চড়চড়, চড়াই, চড়াক, চতুর, চন্দন, চপেটাঘাত, চপ্পল, চাকতি, চাকলা, চাঙ্গা, চাঙ্গাড়ি, চাঁছা, চাটা, চাটি, চানা, চাপড়, চাপা, চাঁপা, চামচিকা, চার, চারা, চাল, চালনি, চালা, চালুনি, চিকা, চিকুর, চিক্কুর, চিটা, চির, চিড়চিড়ে, চিড়িতন, চিড়বিড়, চিতা, চিবা, চিবানো,

চিমটা, চিমটি, চিরা, চিরুনি, চিল, চিলতা, চিল্লাচিল্লি, চিলে, চিংড়ি, চুকানো, চুড়ি, চুত, চুপসা, চুবানো, চুনা, চুয়ানো, চুল, চুলকানি, চুলা, চূড়, চূড়া, চূণ, চেঙ্গা, চেঙ্গারি, চেঁচানো, চেটো, চেপটা, চেপা, চেলা, চোকলা, চোকা, চোখা, চোট্টা, চ্যাচানো, চ্যাপটা। ছড়া, ছড়ানো, ছড়ি, ছপ্‌পর, ছল, ছলছল, ছলি, ছাই, ছাঁকা, ছাঁচ, ছিটেফোঁটা, ছিঁড়া, ছিবড়া, ছিলকা, ছিলা, ছুঁচো, ছুকরি, ছুটা, ছুঁড়ি, ছুতা, ছুতানাতা, ছুতার, ছুলা, ছুলি, ছেঁচা, ছেঁড়া, ছেনি, ছেলে, ছোকরা, ছোঁচা, ছোট, ছোঁড়া, ছোবরা, ছোবল, ছোঁয়া, ছোঁয়াচ, ছোলা, ছ্যাঁচড়া। জঙ্গম, জঙ্গল, জটলা, জটা, জটিল, জড়, জড়াজড়ি, জড়ুল, জবুথবু, জমক, জমকালো, জাঁকজমক, জাবর, জালা, জালি, জুজু, জুটা, জুটি, জুড়ি, জোট, জোড়া।

ঝগড়া, ঝট্, ঝড়, ঝরঝরে, ঝরণা, ঝরা, ঝলক, ঝলকানি, ঝাউ, ঝাঁকড়া, ঝাঁকা, ঝাঁকি, ঝাঁটা, ঝাড়, ঝাড়া, ঝাড়ু, ঝামটি, ঝামটা, ঝিঁঝি, ঝিনুক, ঝুঁটি, ঝুমকো, ঝুরা, ঝোঁক, ঝোঁকা, ঝোরা, ঝোল, ঝোলা। টইটম্বুর, টক, টক্কর, টগর, টনক, টপকানো, টপাটপ, টলমল, টলা, টলানো, টা, টাক, টাকা, টাকু, টাঙ্গানো, টাঙ্গি, টাটানো, টানা, টাপুরটুপুর, টালমাটাল, টালা, টি, টিপটিপ, টিলা, টুকু, টুকরো, টুকি, টুঁটি, টুনি, টুপটাপ, টেকো, টেনা, টেপা, টোকা, টোল। ঠাট, ঠার, ঠেকানো, ঠেলা, ঠোকরানো, ঠোঁট। ডাঁট, ডাঁটা, ডাঁটি, ডাবা, ডাল, ডিগবাজি, ডিঙ্গি, ডুবা, ডোঙ্গা, ডোম। ঢলঢলে, ঢাউস, ঢিট, ঢিপঢিপ, ঢিলা, ঢেকুর, ঢোল, ঢ্যাঁঢরা। তক্কেতক্কে, তড়পানি, তড়িৎ, তরঙ্গ, তর্ক, তাক, তাড়া, তাড়ি, তাণ্ডব, তাঁতি, তাম্বুল, তাল, তালা, তালাই, তালি, তালু, তিল, তীর, তীর্থ, তুঙ্গ, তুড়ি, তুঁত, তুলসী, তুলা, তুলি, তুষ, তেঁতুল, তেনা, তেপান্তর, তেলাকুচা, তোড়, তোড়া, তোতলা, তোলা, ত্যাঁদোড়। থই, থমকা, থর, থরথর, থাপ্পড়, থাবড়া, থাবা, থামা, থুতু, থোক, থোকা, থোপ, থ্যাঁবাড়। দই, দগদগে, দঙ্গল, দড়, দড়া, দড়ি, দণ্ড, দদ্রু, দমক, দল, দাগড়া, দাঁড়, দাদ, দাদা, দাবানো, দাবড়ানি, দামড়া, দীপ, দুধ, দুব্বা, দুমড়ানো, দোনা, দোলা, দৌড়া। ধড়া, ধপ্, ধাড়ি, ধাঁতানি, ধাপ্পা, ধীবর, ধেইধেই, ধেড়ে, ধোঁওয়া, ধোপা, ধোলাই। নগর, নটে, নড়ন, নড়া, নথ, নঁনদ, নন্দ, নয়নজুলি, নরক, নরুণ, নল, নাই (লাই), নাঙল (লাঙল), নাড়ি, নাদা (লাদা), নারঙ্গ, নালা, নিঙড়ানো, নিড়ানো, নিবিড়, নির্ঝর, নিরানা, নিরেট, নিলয়, নীর, নুকানো, নুড়ি, নেঙটা, নেত্রে, নেবু, নোঙর, নোল। পইপই, পঙ্গু, পচা, পঞ্জর, পটাপট, পটকা, পটল, পট্ট, পট্টি, পড়া, পয়া, পরত, পরদা, পরাগ, পরী, পলি, পল্লী, পাখনা, পাঁচালি, পাছা, পাজা, পাট, পাটনি, পাঁঠা, পাড়, পার। পাড়া, পাড়ি, পাতলা, পাতি, পারাবত, পারুল, পাল, পালক, পালঙ, পালট,

পালটানো, পালন, পালা, পালি, পাল্লা, পাহাড়, পিক, পিচ, পিচকারি, পিঁচুটি, পিছল, পিটপিট, পিটানো, পিটুলি, পিঠা, পিঁড়া, পিণ্ড, পিতল, পিত্ত, পিলে, পুকুর, পুঙ্খ, পুঁচকে, পুঁছা, পট, পুঁটি, পুঁটলি, পুড়িয়া, পুলে, পুষ্করিণী, পুষ্প, পূজা, পেঁচা, পেট, পেটানো, পেলব, পেল্লাই, পোঁ, পোকা, পোঁটলা, পোড়ানো, পোড়ো, পোতা, পোঁদ, পোরা, পোলা, পোলুই, প্যাঁচ, প্যাঁচপেঁচে, প্রগলভ, প্রজাপতি, প্রবাল। ফক্কর, ফক্কা, ফচকে, ফচফট, ফট্, ফটাফট, ফণা, ফল, ফলক, ফলনা, ফসকা, ফাঁক, ফাঁকা, ফাটল, ফাঁদা, ফাঁদ, ফাঁপা, ফাল, ফালাফালি, ফিঙা, ফুঁ, ফুঁকলা, ফুটকি, ফুটা, ফুল, ফুলা, ফুসকুড়ি, ফুসফুস, ফেরৎ, ফেলা, ফোকলা, ফোকর, ফোঁটা, ফোঁড়া, ফোঁপানো, ফোসকা, ফ্যাকড়া। বকবক, বকা, বকুনি, বকুল, বগল, বঙ্গ, বড় (বট), বঁড়শি, বড়া, বন্ধ্যা, বন্যা, বরবটি, বল, বলয়, বলি (রেখা), বাউলি, বাঁও, বাঁক, বাঁকা, বাখারি, বাগড়া, বাগানো, বাঁচা, বাচ্চা, বাছ, বাজা, বাঁজা, বাটা, বাটি, বাড়া, বাড়ি, বাতা, বাদাড়, বাদুড়, বান, বাবুই, বারণ, বালা, বালাই, বিচি, বিছানা, বিগড়া, বিটকেশ, বিড়ি, বিনুনি, বিরল, বিল, বিলানো, বিলি, বিল্লি, বীজ, বুঁচি, বুঁজা, বেগুন, বেঙ্গ, বেজার, বেট, বেটি, বেড়, বেড়া, বেঁড়ে, বেনি, বে, বেদে, বেয়াই, বেয়ান, বেল, বেলা (তীর), বেশ্যা, বোকা, বোঁচা, বোজা, বোঁটকা, বোঁড়শি, বোবা, বোড়ো, ব্যাঙ, ব্যাধ।

ভাগ, ভাগা, ভাঙ, ভাঁড়, ভাড়া, ভাণ্ড, ভাত, ভাল, ভিটা, ভিল, ভুঁড়ি, ভুড়ভুড়ি, ভৃঙ্গ, ভেঙানো, ভেড়া, ভেতো, ভেঁপু, ভেলা, ভোঁটকা, ভোর, ভোল। মই, মকাই, মগ, মচকা, মটর, মটকা, মটকি, মঠ, মড়ক, মণ্ড, মণ্ডল, মন্দির, মালা, ময়ুর, মরিচ, মরু, মর্কট, মলয়, মল্ল, মল্লিকা, মসী, মসূর, মহিলা, মাউই, মাকু, মাকুন্দ, মাখা, মাগ, মাগী, মাচা, মাচান, মাঠ, মাড়, মাড়া, মাদল, মাদুর, মান্না, মামা, মামী, মারী, মালাই, মাসি, মাষ (কলাই), মাহুত, মিটমিট, মিটানো, মিনকিনে, মিন্‌সে, মিরগেল, মীন, মুকুট, মুকুল, মুক্তা, মুখ, মুচি, মুটকি, মুটিয়া, মুড়কি, মুড়া, মুড়ি, মুড়ো, মুণ্ড, মুরলি, মেয়ে, মেলা, মোচড়, মোচা, মোছা, মোট। মোটা, মোড়, মোড়ক, মোড়ল, রসুন, রাত্রি, রেডি। লকলক, লটপট, ললাট, লহরী, লাঙ্গল, লাটা, লাটিম, লাট্টু, লাঠি, লালা, লালু, লিকলিকে, লুকানো, লুটানো, লুণ্ঠন, লেবু, লোচ্চা, ল্যাংটা, ল্যাংড়া। শঠ, শব, শাক, শাপলা, শার্দুল, শালি (ধান), শিউলি, শির, শিরা, শিরীষ, শীতলা, শুকতারা, শুটকি, শুঁড়, শুশুক, শৈবাল। সড়সড়, সড়াৎ, সত্তা, সরা, সরু, সামলানো, সারি (পংক্তি), সারানো, সিটকানো, সিঁড়ি, সূচনা, সোজা। হড়কা, হট্টগোল, হরিম, হল্লা, হাঁচি, হাট, হাটা, হাঁটু। হাঁড়ি, হাতড়ানো, হাতা, হাঁদা, হানা, হাম, হামা, হামাগুড়ি, হামলা, হালুয়া,

হাল্‌কা, হিকা হিঁচড়ানো/ছিঁচড়ানো, হিড়হিড়, হুড়কা, হুড়মুড়, হুমড়ি, হেঁচকি, হেলা, হৈচৈ, হোগলা, হোঁচট, হ্যাঁ, হ্যাঁচকা।

সত্যনারায়ণ দাশ বাংলায় দ্রাবিড় শব্দের যে তালিকা দিয়েছেন তার নির্বাচিত যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা পর্যালোচনা করলেই ঐ সব শব্দ যথার্থই দ্রাবিড় থেকে উৎপত্তি কিনা সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠবে। সত্যনারায়ণ দাশের গ্রন্থটির পুরো নাম, *বাংলায় দ্রাবিড় শব্দ* (ব্যুৎপত্তিকোষ), স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন শব্দের যে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে তা পর্যালোচনার দাবী রাখে, সে কারণেই আমরা কিছু উদাহরণ দিচ্ছি, সংকেত চিহ্ন ক-কন্নড়, তা-তামিল, তে-তেলেগু, তো-তোদা, দ্রা-দ্রাবিড়, ম-মলয়লম, সমা-সমার্থক প্রভৃতি।

অলক-বি চূর্ণকুন্তল। তা-অলকম— স্ত্রীলোকের কেশ, চুলের গুচ্ছ, তা-অলঙ্কু-ঝোলা, দোলা, ক-অলক চুলের গোছা; টু-অলঙ্কুলি-ঝাঁকানো। প্রাচীন তামিলে অলকম শব্দটি পাওয়া যায়।

আড্ডা- বি. আবাসস্থল। ক্লাব, গল্পগুজব করার নির্দিষ্ট স্থান। বাস ইত্যাদির দাঁড়ানোর জায়গা, ক. অড্ডল— লুকোবার জায়গা, এড, এডে-স্থান; তে, এ্যমু, তে ইটম্-সমা; ইরু আড়ু- খেলা, কো অডসি-বাসা বাঁধা।

ইচর-বি. কচি কাঁঠাল। তু. ইরু-চক্‌কে, কো, পিচে চক্‌কে-সমা। কো-পিচোলি-এক রকমের কাঁঠাল। ক. ইচ্‌লু-খেজুর গাছ।

উগরা- ক্রি. বমি করা। ক. উগল-লালা, থুতু, বমি করা, তা. ওককরি-বমি, দ্র. ওগরানো।

এঁড়ে-বি. ষণ্ড, পুরুষ। ক. এটু-ষাঁড়; তে এরুড়, ম. এরদু, তে. এড্‌ডু, কুরু, ওদ্দো, কোল, এরুতু-ষাঁড়। কাস, এদি, ইরু, ইরুদু ষাঁড়। ককু অড্ডু-ছাগল। >সং এড়-এক রকমের ভেড়া। (গুন্ডার্ট)।

ওৎ- বি. লুকিয়ে অপেক্ষা। ক. ওত্তি-পরাজিত করা, জব্দ করা, তামিল, ওত্তি, তে ওত্তি, ক. ওত্তু- কাবু করা।

কুটির- বি. কুঁড়েঘর, ঘর। তা. কুটি-কুঁড়ে, ঘর; কুট সমা; তা. কোট্টিল-কুঁড়ে, চালাঘর, ম. কোট্টিল সমা; ক. কুট্ট. গ-বাইরের ঘর; টু কোট্ট-আবাসগৃহ; তে-কোটিক-ছোট্ট পল্লী; কোট্টমু-গোয়াল বা আস্তাবেল। কোট্টারি-চালাঘর। > সং কূট, কুটি-গৃহ।

খন্দ-বি. গর্ত। দ্র. কুণ্ড। তা. কুন্টু, ক. কুন্ট, তে. কুন্ট-গর্ত। তা-কেণি-গর্ত।

গণ্ডা- বি. চারের সমষ্টি। ক. গোন্ডে-একগোছা, টু. গোন্ডে সমা; ম. কোন্ট-চুলের গোছা, তা. কোন্টই, তে. কোন্ডে সমা।

ঘাস- বি. তৃণ। ক. কাচি সমা। কুই গসস-জঙ্গল।

চটা- ক্রি. ফাটা। তা. চটই চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া। তা. চবটু-ধ্বংস করা।

ছড়া-বি. আঁচড় লাগা। তা. চলুককু, তাতি, চরি-সমা, ইরু, চোরন্ডু, চুলুককু, আঁচড় দেওয়া।

জমক বি. জাঁক, আড়ম্বর। তাতি. চোকু-সমা। দ্র. চমক, ঝোঁক।

ঝগড়া বি. কোন্দল, বিবাদ। ক. জল, তে. জগড়, তেক-জেগড়ম, কাস জগনা-সমা।

টক্কর বি. ধাক্কা, প্রতিযোগিতা (-দেওয়া)। দ্র. তক্কে।

ঠাট বি. কাঠামো, দেবমূর্তির কাঠামো, চালচলন। তা. তোটু. ক. তুড়ু-জোড়া দেওয়া।

ডাঁট বি. দম্ভ, জাঁক। দ্র. ডাঁট।

ঢেকুর বি. উদ্‌গার। ইরু দেকক-সমা। ক. তেগু, কো. তেকলি-সমা।

তড়িৎ বি. বিদ্যুৎ। টু. তেড়িলু-বজ্র; ক. সিড়িল-সমা। দ্র. চড়ক।

থাপ্পড় বি. চপেটাঘাত। তা. তপ্পু, তপ্পি-আঘাত করা; তে-দব্বেরিঞ্চু-চড় মারা; ককু. তপ্পল-হাততালি; ইরু. তপপু-আঘাত করা।

দই বি. দধি। তা তয়ির, তয়িরু-সমা, সং-দহি, গ্রী-তুরোস-সমা।

ধীবর জাতি ও পদবী বিশেষ। কোল দিবর-মৎস্যজীবী জাতি বিশেষ; নই. ধিবরক-সমা। দিররে-সমা; তা. তেবরু-জাতিবিশেষ; ককু. মিনি দিবাম-জেলে (মিনি-মাছ)

নট বি. শাক বিশেষ। তা নট-চারাগাছ; তামু নট- রোপণ করা, ইরু নুড়-সমা, ক নট্টি-শাকসবজি।

পাট বি, তন্তুবিশেষ। রেশম। তা. পটি-গাছের ছাল; পটু-রেশম। ক. পট্টে, ইরু পট্টে গাছের ছাল। ? সং. পট্ট।

ফল বি. ম. তা. পড়ম, পলম-পাকা ফল; টু. পরন্দু-পাকা ফল; তে-পন্ডু-ফল; তা. পড়ু-বৃদ্ধ বা প্রাচীন হওয়া। ক পড়, পল-পাকা।

বঙ্গ বি. স্থান নাম, প্রাচীন নাম। দ্রাবিড়ে কয়েকটি অর্থ পাওয়া যায়; গভীর জঙ্গল, ব্যাঘ্র অধ্যুষিত অঞ্চল; সমতল ভূমি, স্বর্ণভূমি। তা. বেঙ্কই- বাঘ, ম. বেঙ্গি- বাঘের বাসভূমি, বাঘ; কো. বঙ্গারি-ঘন ভয়ংকর বন। ২. তা. বেঙ্করস-সোনা, তে. বঙ্গারমু-সোনা; টু. বঙ্গর, কো. বঙ্গার, কাস. বেঙ্গল-সোনা। ৩. কুই পঙ্গল দিনে- সমতল ভূমি; কুবি পঙ্গল রজি- সমার্থক। ৪. কগৌ বঙ্গারি-গৌড়াদের একটি 'বলি' (শাখা)। ৫. কো. পোঙ্গি, পোঙ্গয়ি-শস্য। ৬. ইরু বঙ্গু-গ্রাম। উল্লেখ্য যে দ্রাবিড় গ্রামনাম পাওয়া যায়-বঙ্গবুরু, বঙ্গলপড়িসে (ইরুলদের); বেঙ্গিনাদি (কোড়গুদের)। প্রাচীন তামিল সাম্রাজ্যের দুটি জনপদ ছিল বঙ্গল, বেঙ্করম।

ব্যুৎপত্তির উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় সত্যনারায়ণ দাশ বাংলায় দ্রাবিড় কৃৎঋণ শব্দ সনাক্ত করতে গিয়ে ধ্বনি সাদৃশ্য অপেক্ষা অর্থ বা তাৎপর্যকে কম গুরুত্ব প্রদান করেননি। সত্যনারায়ণ দাশের ব্যুৎপত্তিগুলি ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব সম্ভাব্য মনে না-ও হতে পারে। সর্বোপরি তিনি দ্রাবিড় উৎস থেকে আগত নয় এমন বহু অনার্য বিশেষত ধ্বন্যাত্মক শব্দ তাঁর তালিকাভুক্ত করেছেন।

রফিকুল ইসলাম